মূল্যবোধের ইতিহাস

অতীন্দ্রিয় পাঠক

মূল্যবোধ শব্দটি ইদানীং নানা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর দ্বিস্তরিক বিন্যাসে একদিকে সর্বদাই তার ভঙ্গুর হবার প্রবণতা। অন্যদিকে এর স্থায়িত্বের ওপর ব্যক্তির বা জাতির স্থিতিস্থাপকতা নির্ভরশীল। এই দ্বিচারিতাই শব্দটিকে স্পর্শকাতর করেছে। ফলত মূল্যবোধ শব্দটি যত বেশী চর্চিত, বক্তৃতায় বা আলাপচারিতায় যত বেশী উচ্চারিত, ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনযাপনে ততটাই কম প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কথা ও আচরণের মধ্যে যোগসূত্র নাথাকবার কারণে শব্দটি সম্পর্কে অনচ্ছ ধারণা গড়ে উঠেছে।

শব্দটি লক্ষ্য করলে দেখব, দুটি শব্দের যৌগে এটি গঠিত। মূল্য শব্দের সঙ্গে বোধ শব্দটি যুক্ত হয়ে, প্রথম শব্দটির প্রেক্ষিত যদি সার্বিক, দ্বিতীয় শব্দটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই যৌগেই জটিলতা তৈরী হয়েছে। অতএব প্রথম মূল্য শব্দটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যাক।

আমাদের সামাজিক জীবনযাপনে বিনিময় একটি মৌল ঘটনা, সেই আদিকাল থেকেই। মুদ্রা প্রচলনের আগে এই বিনিময় দ্রব্যের মাধ্যমে ঘটত। আধুনিক অর্থসাপেক্ষে তাকে অর্থমূল্য না বললেও, দ্রব্যমূল্য অবশ্যই বলা যায়। এই মূল্য শব্দের একটা ইতিহাস আছে। আভিধানিক অর্থে মূল্য অর্থে যা মূলের অতিরিক্ত। মূল্য উপাদান থেকেবস্তু উৎপন্ন করে পারিশ্রমিক হিসেবে কোনো কাকর্মী অতিরিক্ত যে উপাদান লাভ করতেন, মূল্য থেকে গৃহীত বলে তাকেই মূল্য বলা হত, যা কাকর্মীয় পারিশ্রমিক বা কর্মযোগ্যতার মূল্য। বিস্তৃত ইতিহাস না জানা থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, কাকর্মীর যোগ্যতা অনুযায়ী সেই অতিরিক্তের হেরফের ঘটত। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মূল্যের পরিমাণব্যক্তি - নির্বিশেষে নির্দিষ্ট হত না, ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হত।

পরবর্তীকালে অর্থনীতির বিচারে মূল্য উপাদানও মূল্যে সংযোজিত হয়েছে, যেহেতু সেই উপাদান সংগ্রহ বা নিষ্কাষিত করা বা উৎপন্নের জন্যে পারিশ্রমিক দিতে হয়। ফলে মূল্য এখন আর মূল্য - অতিরিক্ত নয়, দ্রব্যমূল্য সহ পারিশ্রমিক দিতে হয়। ফলে মূল্য এখন আর মূল্য - অতিরিক্ত নয়, দ্রব্যমূল্য সহ পারিশ্রমিক। এর সঙ্গে যুক্ত হল আরো নানা অনুষঙ্গ। পুঁজির সঙ্গে এই অনুষঙ্গগুলি যুক্ত হয়েছে, কেননা মানুষের লোভ এই পুঁজিকে স্থির থাকতে দেয় নি, তার বৃদ্ধির জন্যে লাভ, সুদ ইত্যাদি যুক্ত করে এক জটিল পদ্ধতিতে উৎপন্ন বস্তুর মূল্য নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ যে অর্থের বিনিময়ে উৎপন্ন বস্তুটি বিক্রী হবে তাকেই মূল্য বলা হয়। বলা বাহুল্য, সমস্তপ্রক্রিয়াটি গভীর জটিলতার ভেতরে চলে গিয়ে মূল্য শব্দের সরল অর্থটি আর নেই, মূল নির্ভর নয় আর, বরং ক্ষমতাবানদের নান রহস্যময় যোগসাজসে আবর্তিত হয়ে তার স্থিরতা নেই, সচল থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

এই জটিলতা সত্বেও সমাজে যে কোনো বস্তুর চলমানতার জন্যে তার একটি সামাজিক মান নির্ণয় করা হয়। সেই জটিলতার কারণেই সেই মান অনড় থাকে না, ফলে সামাজিক মানও চলমান। তা হত্বেও যে কোনো বস্তুর সময় - বিশেষে মূল্যমান থাকে ধরে নিতে পারি। এই চলমানতা মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতির হার ইত্যাদি নানা অভিধায় আধুনিক অর্থনীতিতে মূল্যমানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে। অতএব আধুনিক অর্থনীতির নিরিখে জাগতিক যে কোনো বস্তুরই একটা সামাজিক মূল্যমান আছে, তা রাষ্ট্র - অনুমোদিত, যদ্যি তা বাণিজ্যপ্রভূদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এর সমার্থক নয়। সেখানে মূল্য শব্দের সঙ্গে বোধ শব্দটি যুক্ত হয়ে তা অনুভব আশ্রিত। অনুভব ঘটে ব্যক্তির চেতনায় নির্ভর করে তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, যা কোনো বিষয়ের মূল্য নিরূপণ করে। সামাজিক প্রয়োজনের বাইরে কোনো বস্তু ও বিষয়ের সামাজিক মূল্যমান হয়ত গুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু কারো বোধে তা অশেষ গুত্ব পেয়ে যায়। বিপরীতও ঘটে, মূল্যমানে গুত্বপূর্ণ কোনো বস্তু বা বিষয় কারো বোধে কোনো গুত্বই পায় না, যেমন সামাজিক প্রয়োজনে যে বস্তুর মূল্য নেই, তা কোনো শিল্প - সংগ্রাহকের কাছে হয়ত অমূল্য, বিপরীতে, প্রাসাদ, বিলাসব্যসন ইত্যাদি একজন সংসারীর কাছে মূল্যবান হলেও একজন সন্ন্যাসীর কাছে তার মূল্য নেই। আমরা প্রায়শ দেখি, সাধারণ পটভূমিতে যে দৃশ্য অতি - সাধারণ, ক্যামেরা - শিল্পীর চোখে তা অনন্য, যেহেতু শিল্পীর সেই চোখ বোধ - উৎসারিত আবিষ্কারকের চোখ, সাধারণ সূর্যমুখী ফুল যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়, ভ্যান গখের ক্যানভাসে তা অসামান্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে, কোনো লেখক রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পাশাপাশি চলমান কোনো তণ - তণীর সাধারণ কিছু সংলাপ তাঁর বোধে এমন অভিঘাত সৃষ্টি করে, যার সূত্র ধরে একটা উপন্যাস পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, যা হয়ত সেই তণ - তণীর জীবন - সম্পর্কিত আদৌ নয়, প্রকৃতির রাজ্যে, পশুপাখির নানা কলরবে কত যে সুর সাধারণের অলক্ষ্যে থাকে, অথচ একজন সঙ্গীত শিল্পীর বোধে তা অনুরণিত হয়ে অপূর্ব সঙ্গীতের জন্ম দেয়।

এইসব সূত্র ধরে যে বিভাজনটি লক্ষ্য করি, তা এই রকম, --- একদিকে সামাজিক মূল্যমানে গৃহীত বিষয়সমূহ একটি সার্বিক পৃথিবীর প্রবহমান স্রোতে বয়ে চলেছে, পাশাপাশি অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিনিধি যে বিশিষ্ট ব্যক্তির তাঁদের মূল্যবোধে গৃহীত বিষয়সমূহের অনেক অনেক স্রোত প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পৃথিবীতে। সরাসরি এই দুয়ের যদিও কোনো ছেদবিন্দু নেই, কিন্তু পরোক্ষে সার্বিক পৃথিবীর সঙ্গে এই ব্যক্তি - পৃথিবীগুলির একটা যোগসূত্র রচনা হয়, যেঅর্থে আমরা সামাজিক মূল্যবোধ কথাটি সাধারণভাবে ব্যবহার করি।

বস্তুত, পরিবার বা সমাজের কোনো বোধ থাকে না, ব্যক্তিবিশেষের থাকে। তারা পরস্পর ভিন্ন হলেও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যবোধই পরিবার বা সমাজের প্রয়োজনে পারিবারিক বা সামাজিক মূল্যবোধ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ব্যক্তির মূল্যবোধ যতটা স্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য, পারিবারিক মূল্যবোধ ততটা স্পষ্ট নয়। পরিবারে যারা প্রভাবশালী, সেই ব্যক্তিদের মূল্যবোধ পারিবারিক মূল্যবোধ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি সমান মূল্যবোধে চালিত না হলেও। একইভাবে সামাজিক মূল্যবোধও চিহিত হয় অগ্রণী ব্যক্তিদের মূল্য বোধের মাধ্যমে, সেখানেও সমস্ত ব্যাক্তির বা পরিবারের মূল্যবোধ এক হবে এমন না-ও হতে পারে। একই সঙ্গে এটাও ঘটনা, সমাজে অগ্রণী ব্যক্তিদের মূল্যবোধ বিকৃত হলে তার বা বিবর্তিত হলে তার প্রভাব পারিবারিক মূল্যবোধের ওপর এবং পরিবারের মূল্যবোধ বিবর্তিত বা বিকৃত হলে তার প্রভাব ব্যক্তির মূল্যবোধের ওপর পড়বে। ব্যতিত্রম অবশ্যই থাকে, সামাজিক মূল্যবোধে বিপর্যয় সত্ত্বেও কিছু কিছু অগ্রণী ব্যক্তি তাঁদের মূল্যবোধ অটুট রাখেন এবং পারিবারিক মূল্যবোধের বিপর্যয়েও কিছু ব্যক্তির মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয় না। তফাৎ এই, সংখ্যালঘু হবার কারণে এদের কোনো প্রভাব পরিবার বা সমাজে কার্যকরী হয় না।

মূল্যবোধের এই রকম নিরপেক্ষ সংজ্ঞা শুভঅশুভ উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলেও সাধারণভাবে মূল্যবোধ অর্থে আমরা শুভবোধ-প্রাণিত মূল্যকেই চিহিত করি। যেমন বিবেকিতা, সাম্যবোধ, অহিংসা, উদারতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের হানি ঘটলে মূল্যবোধ অবক্ষয়িত হয়েছে ধারণা করি। আগের প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের ধ্যান ধারণা লক্ষ্য করে প্রায়শ হতাশা প্রকাশ করে, এদের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। এর উত্তরে পরের প্রজন্ম স্বাভাবিক ভাবেইবলে, পুরনো ধ্যানধারণা এমন অচল, মূল্যবোধ পাল্টে গেছে, এখন বাঁচতে গেলে পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা চলে না। অতএব সার্বিক ঘটনা এই বিভিন্ন যুগে অগ্রণীদের (শুভ - অশুভ নির্বিশেষে) মূল্যবোধই সামাজিক মূল্যবোধগঠন করে, প্রভাব আসে পরিবারের ওপর , ব্যক্তির ওপর। ব্যতিত্রম বাদ দিলে অন্যরা তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ শব্দটিও ইদানীং ব্যবহার করা হয়। যদিও রাজার নীতি অর্থে রাজনীতি, তবু সাম্রাজ্য - ধারণা থেকে রাষ্ট্রধারণায় পৌঁছেও সেই শব্দটিই সংস্কারবশত চলে এসেছে। অতীতে রাজারা যখন রাজত্ব করতেন, প্রত্যেকের নীতি অবশ্যই এক ছিল না তবু প্রকৃত রাজার কেমন আচরণ হওয়া উচিত তার নির্দিষ্টতা ছিল, সেই বিচারে রাজাদের গুণাগুণ বিচার হত। যেমন রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরকে আদর্শ রাজা ধারণা করে তার তুলনায় দুর্যোধন বা রাবণের আচরণ নিন্দনীয় ছিল, যদিও আমরা জানি যে রাবণ বা দুর্যোধনের আচরণ বর্তমান রাজনৈতিক মূল্যবোধে ততটা নিন্দনীয় হয়ত মনে হবে ন

া।

যাই হোক, এভাবেই যুগে যুগে সামাজিক বা রাজনৈতিক মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটে গিয়ে নতুন নতুন মূল্যমান তৈরী হয়েছে। সাধারণ ব্যক্তিরা, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সেই মূল্যমানের দ্বারা চলিত হতেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ ঘটনা এই, বিশিষ্টদের সৃজনশীল মূল্যবোধ যে মূল্যমান নির্দিষ্ট করে, পরবর্তীকালে সেই মূল্যবোধের বিবর্তন মূল্যমানেরও পরিবর্তন ঘটায়। অতএব মূল্যবোধের বিবর্তন প্রসঙ্গটি এখানে বিচার্য হয়ে উঠছে, কেননা এইসব ঘটনা বিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়। এই বিবর্তন যদিও ব্যক্তিগত বোধের আন্তঃ প্রেরণায় ঘটে, অবশেষে আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরেও পরিস্থিতির নির্ণায়ক। এটি গুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, মূল্যবোধের বিবর্তনই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়কে চালনা করে। এই বিবর্তন - প্রক্রিয়ায় যে স্তরগুলি বিবেচনার যোগ্য তা হল, শিক্ষা, সংসার, সমাজ, রাজনীতি এমন কি আধ্যাত্মিকতাও।

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ব্যক্তিগত স্তর থেকে উৎসারিত মূল্যবোধ অবশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ গঠন করে। এই গঠিত মূল্যবোধও সমস্ত অঞ্চলে সমান হয় না, এমনকি খ্বায়ন নামক কৃত্রিম প্রক্রিয়া সত্ত্বেও। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার ভিন্নতা এই বৈচিত্রের কারণ। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষ কখনো আগ্রাসন, লুণ্ঠন ইত্যাদি পথে যায় নি বা তাকে যেতে হয় নি। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কে তারা বলীয়ান ছিল, বরং নিয়মিতভাবে আক্রান্ত হয়েছে। বিপরীতে, সম্ভবত প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য এবং ভোগবৃত্ত মূল্য ধর্ম হওয়াতে পাশ্চাত্যদেশগুলি বরাবর আগ্রাসী, লুণ্ঠনকারী। অতীতে রোমান সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই এর উৎসভূমি। আধুনিক যুগেও প্রায় প্রতিটি পাশ্চাত্যনীতি আগ্রসনের পথে গিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে যা অতি - ইদানীং কালেও অব্যাহত। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বদলে তার নতুন নামকরণ অর্থনৈতিক আগ্রাসন। ইসলাম ধর্মও তাদের রাজ্যবিস্তার সেই আগ্রাসনের পথে ঘটিয়েছে। ফলে খৃষ্টান ও ইসলামধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অবধারিত যুদ্ধগুলি ঘটেছিল যা ইতিহাসে ক্রুসেডের যুদ্ধ নামে পরিচিত, অবশেষে ইওরোপীয় রেসেশাঁসের জন্ম হয়েছে। মনীষার উজ্জ্বল দীপ্তি ও লুণ্ঠনের তীব্রতা, এই দুয়ের যৌগ এই রেনেশাঁস। ঐতিহ্যের ভিন্নতা এখানেই, যার মূল সূত্র এক কথায় বলা যেতে পারে পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে ভোগপ্রবণতা, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ত্যাগপরায়ণতা। মূল্যবোধের বিবর্তন এই উভয় অঞ্চলে ঘটতে ঘটতে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাদের মূল সূত্র কখনো ছিন্ন হয় নি, কোনো কোনো সময় আপাতদৃষ্টিতে ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছে মনে হলেও। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ভিন্ন অন্য কোনো বহিরাগত ধর্ম ভারতবর্ষে শিকড় গাড়তে পারে নি, এমনকি মুসলমানরাও তাদের দীর্ঘকাল রাজত্ব ও বসবাস সত্ত্বেও মূল ভারতবাসীর সঙ্গে একটা দূরত্ব তবু থেকেই গেছে মূলত ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে। কখনো কখনো আত্মীয়তা সূত্র গড়তে চেষ্টা হয়েছে, স্থায়ী হয় নি। অবশেষে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদি আলাদা স্বদেশ তৈরী করে নিয়েছে। তাদের মূল্যবোধ যে স্বতন্ত্র, এটা বারবারই প্রমাণিত। অতএব ঐতিহ্যের এমনই এক দৃঢ় গঠন আছে যা অবধারিতভাবে মূল্যবোধেব ওপর প্রভাব রাখে।

এই প্রেক্ষিতে, মূল্যবোধের বিভিন্ন যে স্তরগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণে প্রথমে প্রাচ্যের এই অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। প্রাচীন ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমের বিধি ছিল। প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক যা কিছু আচরণীয়। বোঝা যায়, ভারতীয় দর্শনের সারভূত চিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তা জীবনযাপনে প্রতিফলিত করাই উদ্দেশ্য। এই আশ্রম অন্য অর্থে ছাত্রাবস্থার, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় সংযমের ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের পর্ব। তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না, গুই শিক্ষক। ছাত্রেরা গুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করত সরাসরি গুর মুখ থেকেই। এই বিদ্যাদানে কোনো পারিশ্রমিক ছিল না, গু অর্থাৎ শিক্ষক এই বোধে প্রাণিত থাকতেন যে, যে বিদ্যা তিনি অর্জন করেছেন তা শিষ্যকে, যে তাঁর পুত্রবৎ, দান করা কর্তব্য। এমনকি ছাত্রের থাকা - খাওয়ার প্রতিদানও বিধি ছিল না, শুধু গুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে জীবন নির্বাহ করতে হত। ব্যক্তিগত স্তর থেকে ব্যক্তিগত স্তরে শিক্ষার এই প্রবাহ, ছাত্রের বোধ এতেউন্নত হত, সে প্রস্তুত হত এই অনুশীলন পরবর্তী সমাজ - জীবনে প্রতিফলনের জন্য।

মহাভারতের একটি উপাখ্যানে আমরা পাই, গু আয়ধধৌম্যের উপমন্যু নামে এক শিষ্য ছিল। তার ওপর দায়িত্ব ছিল, গুর গো - সম্পত্তি দেখাশোনা করা। শিষ্যকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে গু একদিন তার খাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। শিষ্য জানাল, ভিক্ষে করে সে খায়। গু আদেশ করলেন, ভিক্ষে করে পাওয়া যা কিছু যেন তাঁকে অর্পণ করে। শিষ্য সেই আদেশ পালন করলেও গু কিন্তু তা থেকে শিষ্যকে খাবার জন্য কিছুই দিলেন না, এরপর থেকে সে দ্বিতীয়বার ভিক্ষে করে জীবন নির্বাহ

করতে থাকল। গু তাও নিষেধ করলেন। বাধ্য হয়ে তখন গর দুধ খেয়ে, এমনকি বাছুরের মুখের ফেনা খেয়ে জীবনযাপন করলেও প্রতিক্ষেত্রে গু নিষেধ করলেন। উপায়ান্তর না দেখে শিষ্য একদিন খিদের জ্বালায় আকন্দগাছের পাতা খেয়ে অন্ধ হল। সে অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে কুয়োর পড়ে গেল, সন্ধে হয়ে গেছে। উপমন্যু আসছে না দেখে আসছে না দেখে অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে গু তার খোঁজে বেরিয়ে সেই অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। শিষ্যকে আশ্বিনীকুমারদের স্তব করতে উপদেশ দিলেন। গুর আদেশে উপমন্যু যথাযোগ্য স্তব করে সন্তুষ্ট করলে তারা একটি পিঠে খেতে দিলেন। কিন্তু গুর আদেশ ভিন্ন ত া খেতে রাজি নয় উপমন্যু। তার এই অসামান্য গুভক্তি দেখে সন্তুষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয় ওর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। গুও সন্তুষ্ট হয়ে, তার যথার্থ জ্ঞানলাভ যেন হয়, উপমন্যু এই বর লাভ করলেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে কাহিনীটি অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তৎকালীন মূল্যবোধ বিষয়ে যে তথ্য আমরা প াই তা হল, প্রথমত বিদ্যাদানে অর্থবিনিময় ছিল না, দ্বিতীয়ত, বিদ্যাগ্রহণকালে শিক্ষকের প্রতি অচল অনুরাগ, তৃতীয়ত, যে কোনো বিপদে আত্মরক্ষার জন্যে যথার্থ বিদ্যার প্রয়োগ করতে শেখা যা উপমন্যু গুর আদেশে অশ্বিনীকুরারদের স্তবপাঠে প্রয়োগ করেছে, চতুর্থত, নিজেকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করতে তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা ইত্যাদির অনুশীলন যা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে উদ্বোধিত করে। প্রাচীন ভারতে ছাত্রদের বোধে এইসবঅনুশীলনই প্রকৃত শিক্ষা বলে বিবেচিত হত।

কালক্রমে সমাজ শিক্ষার দায়িত্ব নিল। এই বিবর্তনের প্রথম পর্বে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাভাবনা সমাজেরমূল্যবোধ রূপে বিবেচিত হয়ে ব্যক্তির আত্ম - উৎসারণ প্রাধান্য পেয়েছে। একে শৃংখলাবদ্ধ করতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরী হল, একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে ছাত্ররা এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ করত।

বিশিষ্ট ব্যক্তি মানেই শুভবোধসম্পন্ন, এমন না - ও হতে পারে। অশুভরা দায়িত্ব নিলে তাদের মূল্যবোধই সামাজিক মূল্যবে াধে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে একদা মৌল আদর্শ ছিল ত্যাগব্রত। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে প্রথম প্রথম মৌলিক জ্ঞান ার্জনের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হলেও, তাদের প্রযুক্তি - প্রসারণ ভোগবৃত্তের দিকে ক্রমশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এমনকি তথাকথিত বিশিষ্টরাও ব্যতিক্রম থাকছে না। মনের স্থিতি বিচার করে এই সিদ্ধান্ত সহজেই নেয়া যায়, যে, ত্যাগই মানুষকে হিতৈষণায় প্রবৃত্ত করে কিন্তু ভোগপ্রবণতায় মানুষ ক্রমশ যন্ত্র - মানুষে পরিণত হয়। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই সামাজিক শিক্ষা ক্রমশ বিবর্তনে যন্ত্র - মানুষে পরিণত করার কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৌলিক শিক্ষার ক্রমশ যৌগিক রূপ অর্থাৎ সামাজিক প্রভুদের নির্দেশে যান্ত্রিক শিক্ষার বিবর্তিত হওয়ার মূল কারণ শুভবোধ আচ্ছন্ন বিশিষ্টদের স্থান অশুভ ব্যক্তিদের দখলে চলে গিয়ে মূল্যবোধের বিপরীতমুখিনতা অর্থাৎ ত্যাগের আদর্শ বাতিল করে, ভোগ্যবৃত্তে চলে যাওয়া। এই বিবর্তিত মূল্যবোধে এই সমস্ত ঘটনাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, -- বিদ্যাদানের বিনিময়ে ক্রমশ উচ্চহারে পারিশ্রমিক নেয়া, শুধুমাত্র ভোগপ্রবণ জীবনযাপনের জন্য যত বেশী উপার্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনের প্রভূত লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা, প াররস্পরিকতা অতিকথায় পরিণত হয়ে শুধুই প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা। এইসব ঘটনা মূল্যবোধের দ্রুত বিবর্তন ঘটিয়ে ম ানুষকে স্বার্থপর করে তুলছে। এই বিবর্তন একজন ব্যক্তিগত উন্নতিকামী মানুষের কাছে হয়ত উপযোগী কিন্তু সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে নিঃসন্দেহে অনুপযোগী এবং ক্ষতিকর। কিন্তু কেমন এমন ঘটল, এটা অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়।

ব্রিটিশরা এদেশে আধিপত্য কায়েম করার আগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র - ভাবনা ছিৎ না। এই বিশাল ভূখণ্ডকে শাসন ও শে াষণের উদ্দেশ্যেই একে রাষ্ট্রে পরিণত করা হল। তার পরিচালন-কর্মকাণ্ডে বিশাল জনশক্তিকে ব্যবহারেরজন্য রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। ফলে সনাতন পদ্ধতিতে টোল চতুষ্পাঠী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক যুক্তিসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হল। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটিতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বেশী থাক ার ফলে এই আধুনিক চিন্তা - মননের ক্ষেত্রটি স্বভাবতই সহরাঞ্চল ও মফঃস্বলী তণদের বেশী আকর্ষণ করেছিল। এই অ াধুনিকতার প্রয়োজন ছিল নিঃসন্দেহে, প্রথমদিকে এর ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই তণরাই নতুন যুক্তি শৈলীর সাহায্যে তার নবজাগরণ সম্ভব করেছে যা উনিশ শতকের প্রধানতম ঘটনা। এই কাজে অনেকানেক শিক্ষাব্রতীর সৃজনশীল মূল্যবোধ পরবর্তীকালে তণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, যার প্রত্যক্ষ ফল কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ করে প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করা। এরই ফলশ্রুতি শিক্ষার নতুন মূল্যমানে জাতীয়তাব াদের উত্থান, অবশেষে স্বাধীনতা - সংগ্রামে উদ্দীপ্তহওয়া।

পাশাপাশি পাশ্চাত্যে যা ঘটেছিল তার হদিস নেয়া যাক। সক্রেটিসের শিক্ষাদান - পদ্ধতি প্রাচীন ভারতীয় ধারার মতই

মৌলিক ছিল। পরবর্তীকালে সক্রেটিস - শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটল যথাক্রমে এ্যাকাডেমীও লাইসিয়াম নামে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে, সেখানে রাষ্ট্রতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদির গভীর অনুশীলন পরবর্তীকালে আধুনিক বিচিত্র মনীষার উত্থানে প্রেরণাস্বরূপ। প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের রচনা থেকে অবশ্য মিশরীয় সভ্যতার কথা জানা যায় যা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপর রোমান সাম্রাজ্যের আগ্রাসন এই ধারবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করে। চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি রোমান সম্রাট খৃষ্টধর্মকে রাজধর্ম ঘোষণা করলে যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গীর্জার অধীনস্থ হয়ে কূপমণ্ডুকতায় পর্যবসিত হল। এদিকে বিতাড়িত গ্রীক পণ্ডিতেরা মিশর, ইরাক, মেসোপোটেমিয়ায় পৌঁছে গেলে সেইসব ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশে গ্রীক ঐতিহ্য দীর্ঘকাল মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত ও চিহ্নিত হয়েছে। অবশেষে ক্রুসেডের যুদ্ধের সময়ে ওদের উদ্যোগেই ইওরোপে প্রথম ৰিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইভাবে প্লেটো - এ্যারিস্টটলীয় ও অন্যান্য হেলেনীয় ভাবধারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় মনীষিদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল, এর পরের ইতিহাস ইওরোপীয় রেনেশাঁস। --পূর্ব রোমের পতন হলে গ্রীক ভাষাবিদরা কনস্টনটিনোপল ছেড়ে বিভিন্ন শহরে অধ্যাপনা ও চর্চা শু করেন, যার ফলে ইওরোপের সর্বত্র মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। অতএব শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যবোধের যে বিবর্তন সেখানে ঘটেছে, তা হল, একদা যে গ্রীক ঐতিহ্য রোমানদের তাড়নায় দেশত্যাগী হয়েছিল, ধর্মীয় অনুশাসনে অর্গলবদ্ধ রোমান মানসিকতায় তার অভিঘাতে নবজাগরণের মধ্য দিয়ে নতুন দৃষ্টিতে তার পুনদ্ধার। কিন্তু গ্রীক ঐতিহ্যের মনীষা এবং রোমান সাম্রাজ্যের বৈভব এই দুয়ের যৌগে যে নবজাগরণ ইওরোপে ঘটল, উভয় ঐতিহ্যের মূল্যবোধই ভোগবৃত্তে আবদ্ধ থাকায় ইওরোপের যাবতীয় শিক্ষা ও কার্যধারার মূল্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল ঐহিক সুখভোগ। ফলে গ্রীক মনীষার পুনদ্ধারের সঙ্গেসঙ্গে রোমান ঐতিহ্যের আগ্রাসন তাদের প্রেরিত করেছে লুণ্ঠন ও শোষণের মধ্য দিয়ে নিজেদের আরো সমৃদ্ধ করারদিকে। বিপরীতে, ত্যাগব্রতই ভারতীয়দের মূল সূত্র হওয়ার ফলে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও বিকাশ হয়ত হয়েছে, কিন্তু বৈষয়িক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে, এমন কি লুণ্ঠিত হওয়াকেও যেন নিয়তিবদ্ধ বলেই ধারণা করেছে তারা।

সনাতন ভারতে দ্বিতীয় আশ্রম নির্দিষ্ট ছিল গার্হস্থ্য। যথাযথ শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিকতার প্রয়োজন এবং জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে স্পষ্টতা নিয়ে একজন যুবক গৃহস্থ হতেন। মানসিকভাবে এবং আর্থিক বিচারে সবাই সমান হয় না, এই তথ্য জেনে পারস্পরিকতা - সূত্রে একত্রে থাকা বিধি ছিল যা যৌথ পরিবারের জন্ম দিয়েছিল, যথেচ্ছ না হয়ে পরিমিত ভোগ, প্রয়োজনে অন্যের জন্যে ত্যাগ তাদের মূল্যবোধ - আশ্রিত কর্তব্য ছিল।

পুরাণ - কথায় আমার জেনেছি, দেশের চালক - রূপে একজন রাজা আদর্শ গৃহস্থের মত আচরণ করে প্রজাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। নারীর স্বাধীনতা, পিতা - পুত্রের সম্পর্ক, দাদা - ভাইয়ের সম্পর্ক, নারীর সতীত্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদর্শ আচরণ ইত্যাদিরও একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পাওয়া যায় সেইসব পুরাণ - কথায়। বিয়েতে নারীরর নিজস্ব অধিকার ছিল, স্বয়ংবর প্রথায় রাজাদের গুণাগুণ বিচার করে স্বামী নির্বাচন করতেন। রামায়ণে সীতা, মহাভারতে দ্রৌপদী সাবিত্রী এভাবেই তাঁদের স্বামীর নির্বাচন করেছিলেন। দশরথের প্রতিজ্ঞা - পালনের জন্য রামচন্দ্রস্বেচ্ছায় বনবাস নিয়েছেন। রাম বনবাসে গেলে ভরত তাঁর পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে রাজত্ব করেছেন, লক্ষণ তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। মহাভারতের আমরা দেখতে পাই, মাতৃ - আজ্ঞা পালনের জন, তা অজ্ঞতাবশত হলেও, যুধিষ্টিরাদি পাঁচ ভাই এক পত্নীকে গ্রহণ করেন, নারীর পতিপ্রেম, সতীত্বরক্ষা ছিল কিংবদন্তী পর্যায়ের, যেমন সত্যবানের মৃত্যু হলে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে সাবিত্রী তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যমরাজের কাছ থেকে সত্যবানের জীবন ফিরিয়েএনেছেন। হনুমান সীতাকে উদ্ধার করতে এসেছেন, সেই হনুমান রামের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরপুষ হওয়ার কারণে তাঁর কাঁধে চেপে যেতে রাজি হন নি। লক্ষণ চোদ্দ বছর বনবাসকালে সীতার পদযুগল ভিন্ন অন্য কোনো অঙ্গের প্রতি তার দৃষ্টি ছিলো না, এমনকি সীতার ফেলে - দেয়া অলংকার বানররা লক্ষণকে দেখালে চিনতে পারেন নি, অবশেষে রামচন্দ্র তা সনাক্ত করেন, এমনই ছিল অগ্রজের পত্নীর প্রতি সম্মানবোধ। রামায়ণে বনের অদিবাসীরা যাদের রাক্ষস বলা হত, তাদের মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী যারা তারা ছিল রাক্ষস, সেই রাক্ষসরাজ রাবণের পর্যন্ত এমন মূল্যবোধ ছিল, সীতাকে লঙ্কায় এনেও তাঁর সম্মতি না থাকার কারণে গ্রহণ করেন নি। এমনকি দস্যু রত্নাকরেরও পাপেরভয় ছিল, সংসারপালনের জন্য যে পাপ সে করত, সংসারের অন্য কেউ তার ভাগী হবে না জেনে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন, পরবতীকালে কবি বাল্মীকিতে পরিবর্তিত হয়েছেন।

সেইসময় রাজাদের এই আচরণ থেকে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেই মূল্যবোধ সাধ ারণের মধ্যে কতটা প্রতিফলিত হত, এই তথ্য ইতিহাসে না থাকলেও একটা আদর্শ চেহারা যে স্থাপন করা হত, এ বিষয়ে নিঃশংসয় হতে পারি। যেখানে রাজা এই মূল্যবোধে প্রাণিত, প্রজারা সর্বদা তা পালন করতেনা পারলেও সেটা যে তাদের লক্ষ্য থাকত এটাও অনুমান করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য দেয়া প্রয়োজন। ভারতের যে সনাতন ধর্ম, বিদেশীরা যাকে হিন্দুধর্ম আখ্যা দিয়েছে, কখনো বা যাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সে বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা কিন্তু অন্য। ব্রাহ্মণরা নয়, এই সনাতন ধর্ম ধারণ করেছেন এবং সাধারণকে এই দিকে প্ররোচিত করেছেন ক্ষত্রিয়রা। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইত্যাদি অবতাররা প্রত্যেকে ক্ষত্রিয় ছিলনে, যারা ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। মূলত যাগযজ্ঞাদি ব্রাহ্মণদের অধিগত ছিল, পরবর্তীকালে উপনিষদের সময় যখন ভারতীয় দর্শন সনাতন ধর্মের মূল স্রোতে প্রবেশ করল, ঐসব ক্রিয়াকাণ্ডগৌণ হয়ে গেছে। এই ধর্ম ও দর্শনের চর্চ ায় প্রেরণা সঞ্চার করতেন জনক ঋষির মত রাজর্ষিরাই, উপনিষদে এর অনেক নিদর্শন আছে। অতএব রাজাদের গার্হস্থ্য - ধর্মাচরণ যে সাধারণের আদর্শ ছিল, এটি বিশ্বাস করার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। যৌথ পরিবারে নেতার যে গুণ থাকা উচিত তা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র থেকে অনুধাবন করতে পারি। তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা, সত্যবাদিতা ও সমদর্শিতা সেই নেতৃত্বের গুণ। অনেকে অর্জুন ও ভীমের তুলনায় কম যুদ্ধনিপুণ হওয়ার কারণে যুধিষ্ঠিরকে কটাক্ষ করেন, কেউ কেউ পাশাখেলায় চূড়ান্ত বাজি রাখা তাঁর চূড়ান্ত অকর্তব্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভীম ও অর্জুন মহাবীর হলেও যুধিষ্ঠিরের চা রিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর অনুগত ছিলেন, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখে তাঁরা সাময়িক বিরক্ত হলেও বিদ্রোহ করেননি। তৎকালে পাশাখেলা যুদ্ধের মতই ঘটনা ছিল, কেউ আহবান করলে সাড়া না দেয়া কালপুষতা বলে গণ্য হত। ফলে তাতে যুধিষ্ঠিরকে যোগ দিতেই হয়েছিল, যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত লড়তেও চেয়েছেন। তিনি কিন্তু মানসিকভাবে সেই যুদ্ধে হারেন নি, মূল্যবোধহীন কপটতার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এ তথ্য অর্জুন ও ভীমের জানা ছিল তাই সেটা নিয়তি বলেই তাঁরা মেনে নেন। পরবর্তীকালে সেই কপটতার বিদ্ধে তাঁরা যথাযথ প্রতিশোধও নিয়েছেন।

ইওরোপীয় রেনেশাঁস একদিকে যেমন অনেক বিজ্ঞানী ও মনীষীর জন্ম দিয়েছে, পাশাপাশি প্রতিটি ইওরোপীয় জাতিকে সা ম্রাজ্যবাদিতে পরিণত করেছে। তাদের ভোগতান্ত্রিক মূল্যবোধ যথারীতি অধিকৃত ভারতবর্ষের ওপরওপ্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিল, উনিশ শতকের শেষ দিকে স্বামী বিবেকানন্দ যা উপলব্ধি করে সে - বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে গেছেন। প্র াচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করে তিনি যে বিভাজনটি দেখিয়েছেন, ত া এইরকম, --পাশ্চাত্যের ধর্ম হল, কর্মকর, কর্ম করে তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারীহতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করেছে। দুঃখ কষ্টের প্রতিকার করে, নিবারণ করে দুঃখ কমাবার চেষ্টা করেছে তারা, কিন্তু প্রাচ্যের ধর্ম হল, দুঃখকষ্ট সহ্য করে তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে। ভারত এই সমস্যা পূরণ করেছে। দুঃখকষ্ট সহ্য করেই তা নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। সহ্য করতে করতে দুঃখ বলে আর কিছু থাকবে না, পরম সুখ হয়ে দাঁড়াবে।

তৎকালীন ভারতবাসীর আপাত পাশ্চাত্যমোহের প্রতি দুঃখ করে অবশেষে তিনি বলেছেন, জগতে এমন নির্বোধও আছে অনেক, নিকটে সুমিষ্ট জল থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুষগণের খাত বলিয়া লবণাক্ত কূপের জলই পান করিয়া থাকে। বস্তুত, পাশ্চ াত্য ভোগবাদের উৎপীড়নে আজ আমরা যে মহাসংকটের মুখে এসে পড়েছি তা ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি এট াও লক্ষ্য করার, এই সংকটে পড়ে আমরা নতুন মূল্যবোধে প্রাণিত হয়ে ঐতিহ্যের সন্ধানে মুখ ফিরিয়েছি। যদিও ভো গবৃত্তের উৎকট গন্ধ এখনো লেগে আছে তাতে, তবু তা থেকে মুক্ত হওয়া অনিবার্য ঘটনা। ঐতিহ্যে এমনই এক মূল্য নির্য াস থাকে, নিজেদের অস্তিত্ব বুঝে নিতে, বারবার সেই শিকড়ের সন্ধানে যেতেই হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজাদের আচরণ নির্দিষ্ট মূল্যবোধ আশ্রিত ছিল, শাসন করা অর্থে শোষণ বা উৎপীড়ন নয়, তা ছিল প্রজাহিতব্রত। সে কারণে সিংহাসনে বসার আগে প্রজাদের কল্যাণার্থে রাজাকে নানা ব্রত পালন করতে হত। রাজা প্রজাগণের সেবকস্বরূপ, তাদের মতামতের অধীন হয়ে রাজকর্ম নির্বাহ তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনও পরিচ্ছন্ন রাখতে হত। আধুনিক নারী - স্বাধীনতা তত্ত্বের প্রভাবে সীতার অগ্নিপরীক্ষাকে নিন্দা করা হয় ঠিকই, অথচ সীতার প্রতি রামচন্দ্রের প্রেমের অভাব ছিল তা নয়, সীতা তাঁর সদাসঙ্গিনীই ছিলেন কিন্তু রাজারামচন্দ্রকে তৎকালীন মূল্যবোধ অনুসারে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তা করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সেই সময় সাধারণ গৃহস্থদের ব্রত ইত্যাদি নানা ধর্মানুষ্ঠান

করতে হত, অনুষ্ঠানের সময় স্ত্রী সঙ্গে না থাকলে সেই ধর্মকর্ম বিধিসম্মত গণ্য ত না।
এরপর ইতালীয় ম্যাকিয়াভেলীর রাজনৈতিক মতাদর্শ সমগ্র ইওরোপে গৃহীত হয়েছে। সেই আদর্শ যে মূল্যবোধে প্রাণিত ছিল তা রোমক - রাজাদের আদর্শ অনুসারী, যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা অর্জন এবং তা বজায় রাখা। ইওরোপীয় দেশগুলি সেই মূল্যবোধ তাদের উপনিবেশ শাসনকালে ব্যবহার করে, অবশেষে সেই বিজিত দেশগুলিও এখন সেই মূল্যবোধে ন্যস্ত। যদিও শপথগ্রহণের সময় সেই পুরণো মূল্যবোধের ছল আছে, কার্যক্ষেত্রে ক্ষমতা লাভ এবং ভোগপরায়ণতাই মূল উদ্দেশ্য। এই দ্বিচারিতা বর্তমানে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে পর্যবসিত। -- প্রজাদের সেবকহবার ভান করে নিজেদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার ও চূড়ান্ত শোষণ।
যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তৎকালীন ক্ষত্রিয়দের যে রীতি ছিল তা যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে কু - পাণ্ডব যুদ্ধে। প্রথমত বাদী - বিবাদী যে পক্ষ প্রথম অনুরোধ করবে সে - পক্ষ নিয়েই অন্য রাজাদের যুদ্ধে যোগ দিতে হত, দ্বিতীয়ত,যুদ্ধের একটা সময়সীমা মান া হত, এরপর আর বৈরীভাব থাকবে না। এই মূল্যবোধ ভারতীয়রা এমনকি মুসলমানদের ভারত - আক্রমণের সময় পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। আরো যে সমস্ত শর্ত যেমন, অশ্বারোহী পদাতিককে আক্রমণ করবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করবে না, নিজের যে সুবিধে আছে অন্যের না থাকলে তাকে আক্রমণ করা যাবে না, এমনকি ছল প্রয়োগও নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ কোনো অবৈধ সুযোগ নেয়া চলবে না, যদিও সর্বক্ষেত্রে এইসব নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় নি। তবু যারা লঙঘন করত তাদের ঘোর অপযশ হত। এমনকি মহামতি ভীষ্ম পাণ্ডবদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শরশয্যায় স্থাপিত হয়েও সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা ভারতীয় প্রজ্ঞার সারস্বরূপ।
মধ্য এশিয়া থেকে আক্রমণকারীরা আসার আগে পর্যন্ত এই মূল্যবোধ বজায় ছিল, এমনকি পরাজিতদের উপহারাদি দিয়ে সম্মানের সঙ্গে ফেরৎ পাঠানো হত। বিধি ছিল, অপর দেশ বলপূর্বক অধিকার করবে না, পরাস্ত করলে যথাযোগ্য সম্ম ানের সঙ্গে দেশে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মুসলমান বিজেতাগণ হিন্দু রাজাদের সঙ্গে অন্য ব্যবহার করেছিলেন। একবার হাতে পেলে বিনা বিচারে প্রাণনাশ করতে দ্বিধা করত না। ক্রমাগত ভারতবর্ষকে আক্রমণকরা হয়েছে, লুণ্ঠন করা হয়েছে, ন ারীদের অসম্মান করা হয়েছে, এবং এসবই সম্ভব হয়েছে, ভারতীয়গণ সেই পুরণো মূল্যবোধে আশ্রিত ছিল বলেই। সেই মূল্যবোধ মানবিকতার। আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষ সেই একই মূল্যবোধ বজায় রেখে চলেছে, তার জন্য মূল্যও দিতে হচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইওরোপীয়রা যে নীতি গ্রহণ করেছে তা রোমক রণকৌশলে, সাম্রাজ্যরক্ষায় ম্যাকিয় াভেলীর ছক। সেই অমানবিক মূল্যবোধকে আড়াল করতেই হয়ত রাষ্ট্রসংঘ নামক একটি সংস্থা গঠন করতে হয়েছে ত াদের, যদিও তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিয়ে আমরা নিশ্চিত নই।
আমরা যদিও সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকি, তবু অন্য একটি আশ্রয়ের কথা অস্বীকার করা যায়না, তা হল অ াধ্যাত্মিকতা। মানুষ মূলত একাকী হওয়ার কারণে বিভিন্ন আশ্রয়ে থেকেও তার একাকীত্বের নিরসন হয় না, নিজের স্বরূপ - সন্ধানে সে প্রেরিত হয়। তখন আধ্যাত্মিকতাই আশ্রয় দেয় ধর্মের মধ্য দিয়ে। সেই আধ্যাত্মিকতারও মূল্যবোধ আছে। বিভিন্ন ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আত্মস্বরূপের যে বোধ গড়ে ওঠে তাতে মূল্যবোধ নিহিত। বিচার করলে দেখব, সমস্ত ধর্মই মূল মানবধর্মে প্রসারিত হয়ে আছে। এক ঈশ্বরের সন্তান সমগ্র মানবজাতি, তাই ভ্রাতৃত্ববোধ, হিংসারোধ ও আত্মোন্নতিই সেই মানবধর্মের মূল তত্ত্ব। মূল ধর্মের এই উদারতা সংকীর্ণ মনোভাবে আচছন্ন হলে মানবতাবিরোধী হয়ে উঠতে দেখা য ায়, এটি লক্ষ্য করেই ধর্ম সম্পর্কে হয়ত কখনো কখনো বিরূপ মনোভাব জেগে ওঠে। এই সূত্রে বিবেকানন্দ, যথাযথ বলেছেন, লোকে যে সমস্ত শয়তানির জন্য ধর্মকে নিন্দা করে, ধর্ম সে দোষে মোটেও দোষী নয়। রাজনীতিই এই শয়তানির জন্য দায়ী। আর যদি এরূপ রাজনীতি ধর্মের নাম ধারণ করে, তবে তাতে কার দোষ ? ধর্মের অর্থ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা যে আমি আত্মস্বরূপ, সেই অনন্ত পরমাত্মা এবং তার সকল অবতারদের সঙ্গে অচেছদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছি।
ধর্মের এই বাণী পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে মহাপুষরা প্রচার করে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, জরাথুষ্ট, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ইত্যাদির বাণী এই আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের সম্পদ। শ্রীরামচন্দ্র একজন আদর্শ রাজা হয়ে তাঁর জীবন য াপনের মধ্যদিয়ে মানজাতির সামনে আদর্শ স্থাপন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষেপে যা প্রতিফলিত করেছেন, তা এইরকম, --শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বংশধরদের অবলম্বিত ধর্মের কোনো নামনেই, বিদেশীরা এসেছে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম আখ্যা দিয়েছে। ধর্ম এক কিন্তু সম্প্রদায় অনেক। প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাস করে যে একটি ধর্মই চলে এসেছে। তা হল, ম

ানবজাতির লক্ষ্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করাই আমাদের কর্তব্য। ধর্মের নাম দিতে গেলেই ওকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক করে ও সম্প্রদায়ে পরিণত করে। দৃষ্টি স্বচ্ছ করে সামনে এগোনো মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁর বিশাল হৃদয় সকল মতের মধ্যে সত্যকে দেখতে পেয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শত্রুসমক্ষে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তা শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা নামে প্রসিদ্ধ। সেখানেই তাঁর সে বাণী প্রচারিত হয়েছে। এর মূল কথা হল, মূল কেন্দ্রে থেকে প্রসারিত শৃঙ্খলগুলির যে কোনো একটি ধরে ফেলা। কোনো সোপান আর সোপান থেকে বড় নয়, তা তোমার কেন্দ্রে টেনে নিয়ে যাবে। আমরা যে জগৎ দেখছি, আমাদের নিজস্ব মানসিক সংস্কারই তা সৃষ্টি করে। যিনি তীব্র কর্ম্যব্যস্ততার মধ্যে অপার শান্তি এবং অসীম শান্তির মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করেন, তিনিই যোগী।

পৃথিবীর ইতিহাসে দুরকম জাতির একটি ক্রমবর্দ্ধমান, দ্বিতীয়টির উন্নতির অবসান। শান্তিপ্রিয় ভারত ও চীনের পতন হয় অ াবার উত্থানও হয়। অন্য জাতিগুলি একবার তলিয়ে গেলে আর ওঠে না। এই কারণের চীনে নানা অভিঘাত সত্ত্বেও কনফুসিয়াস বারে বারে ফিরে আসেন এবং ভারতের সনাতন ধর্ম বিভিন্ন আচার্যদের আবির্ভাবে বারবার পুনর্জ্জীবিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম সেই সনাতন ধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। তৎকালীন সময়ে অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষত জাতিভেদের ওপর বিরক্ত ছিলেন বুদ্ধদেব। সেই কারণে বোধি, লাভ করার পরে ঈশ্বর ও আত্মা এই তত্ত্বদুটি তিনি বাদ দিলেন। পরার্থে আত্মত্যাগই তাঁর ধর্মের মূল কথা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমস্ত মতবাদ স্বীকার না করলেও তাঁর ম ানবতাবাদ ও পশুপ্রেমকে মর্যাদা দিয়েছেন। সমস্ত প্রধান আচার্যগণ নিজেদের ঈশ্বরাবতার ঘোষণা করে বলেছেন, যারা বিশ্বাসী তারাই মুক্ত হবে কিন্তু একমাত্র বুদ্ধদেবই বলেছেন, কেউ তোমাকে মুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে না, নিজের চেষ্টা দ্বারাই নিজের মুক্তিসাধন সম্ভব করা। ঈশ্বরধারণা পরনির্ভর করে, কর্মহীন করে এবং আত্মাই সমস্ত দুঃখের মূলস্বরূপ। এরপর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন, আমি যে অবস্থা লাভ করেছি, চেষ্টা করলে তোমরাও তা লাভ করবে। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ দান দয়া, ক্ষমা ও করুণা। তাঁকে দেখেই বোঝা যায়, ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়েও, কোনো দার্শনিক মত ছাড়াই এমনকি একজন চরম নাস্তিক জড়বাদীও পরম অবস্থালাভ করতে পারে। এই কারণে, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাপেক্ষা প্রবল, এমন কোনো সভ্যতা নেই যার ওপর এর প্রভাব অনুভূত হয় নি।

যীশুখৃষ্টের উত্থান প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, ইহুদিদের ইতিহাসে দু রকম ধর্মনেতা-পুরোহিত ও ধর্মগুরু। সমগ্র ওল্ড টেস্ট ামেন্টে ধর্মগুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছে। অবশেষে ধর্মগুরা জয়ী হয়েছে। আজকাল গণতন্ত্র ও স াম্যের কথা সকলেই বলে, কিন্তু একজন আরেকজনের সমান, এই কথা বুঝতে সবল মস্তিষ্কও নিরর্থক ভারমুক্ত পরিস্কার মন দরকার। ইহুদিদের এই বিরোধের পরিণতি যীশুখৃষ্টের উত্থান।

যীশুর প্রধান শিক্ষা ছিল- হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম জয়যুক্ত হোক। আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে। এবং আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান। আমি ও আমার পিতা এক। তোমাদের যা কিছু আছে ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর। আমাকে সম্মান কর আর নাই কর, ঈশ্বরের পথে এগিয়ে চল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে, উপদেশ অনুসরণ কর আর নাই কর, আচার্যকে সম্মান কর। তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দোষমুক্ত হতে পার কিন্তু আচার্যকে সম্মান না করলে কোনো ফল হবে না। কেননা ভগবান কেবল একবার মাত্র দেহে আবির্ভূত হতে পারেন। যীশুখৃষ্টের উপদেশ ছিল, নির্বৈর হও। অথচ পরবর্তীকালে খৃষ্টানধর্ম রাজধর্ম হওয়ার ফলে প্রকৃত বোধের অভাবে সেই মূল্যবোধ প্রচারিত হয় নি, যে কারণে তাঁর উপদেশ বাদ দিয়ে যীশুকেই আঁকড়ে ধরতে হয়েছিল। তার উত্তরাধিকারী ইওরোপীয় দেশগুলি রেনেশাঁসের পরবর্তী সময়েও সম্ভবত ঐ একই কারণে যীশুর মূল্যবোধ বহন করতে পারে নি।

রূপাচরণ, পৌত্তলিকতা, উপাসনার নামে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, নরবলি মহম্মদের হৃদয়কে ব্যথিত করেছিল। দিবারাত্র প্রার্থন ার পর জিব্রাইল মহম্মদকে স্বপ্নে বলেন, তিনিই সত্যের বার্তাবহ। যীশু, মুশা ও অন্যদের বাণী লুপ্তহয়ে যাবে। তাই মহ ম্মদকে ধর্মপ্রচার করতে হবে। খৃষ্টানরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসিকরা দ্বৈতভাব প্রচারসু করে। মহম্মদ বললেন, আ ল্লাহ এক। মহম্মদ তার রসুল। এই বাণী মক্কার রাস্তায় রাস্তার প্রচার করতে গিয়ে আক্রান্ত হন ও মদিনায় পালিয়ে যান। যুদ্ধ করতে করতে অবশেষ আরবার ঐক্যবদ্ধ হল। আল্লার নামে ধর্মজগত প্লাবিতহল। মহম্মদের প্রধান বাণী সাম্য। জাতি

বর্ণ এসবের প্রশ্ন নেই, এই সাম্যভাবে যোগ দাও। স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা এক ঈশ্বর শূন্য হতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরোনা না। মসজিদে সঙ্গীত, ছবি, প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ। এককোণে একটি বেদীর ওপর কোরাণ। সবাই সারিবদ্ধ। দাঁড়িয়ে নমাজ পড়বে।

তাদের যে মূলমন্ত্র, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল, মহম্মদের বাণী সাম্য, কোনো ভেদ নেই, সবাই সাম্যভাবে যোগ দাও, - যা বিকৃত হয়ে এমন প্রচার হয়েছে, একমাত্র তাদের উপাসনা - পদ্ধতির বহির্ভুত সবকিছু ধবংস করতে হবে। যে গ্রন্থে অন্য মত প্রচারিত হয়েছে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেবে না তারা কাফের ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও সে- যুগে মুসলমান দার্শনিকরা এই ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ করেছেন যেহেতু তাঁরা সত্যের সংস্পর্শে এসে উদারতা লাভ করেছিলেন।

ফলত এশিয়া ও ইওরোপের মূল্যবোধে বিস্তর ফারাক, নিঃসন্দেহে তা ঐতিহ্য - প্রণোদিত। এই বিষয়টি বিবেকানন্দের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। --এশিয়ার বাণী ধর্মের বাণী, ইওরোপের বাণী রাজনীতির। সেই বাণী প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধবনি মাত্র। নিজস্ব সমাজই গ্রীকদের সর্বস্ব ছিল, অন্য সব বর্বর। গ্রীক মন সম্পূর্ণত মানবিক ও ইহলোকসর্বস্ব। দেবদেবীরাও মানুষ - প্রকৃতি বিশিষ্ট। তাদের সৌন্দর্য বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য। সমগ্র ইওরোপে এরই প্রতিধবনি। এশিয়ার প্রকৃতি অন্য -- অন্তর্মুখী, তার বাহ্যসৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও। এশিয়ার জাতিগুলি ধর্মভিত্তিক তাই কল্পনাপ্রবণ, স্বপ্ন জগতে থাকতেই ভালবাসে। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবুক হতে চায়। এই কারণে জগতের অবতার ও মহাপুষগণ সবাই প্রাচ্যদেশীয়।

তবু মূল্যবোধের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও অঞ্চলদুটি সম্পূর্ণ আলাদা থাকে নি, দর্শনচিন্তা, ভাবনা, প্রযুক্তি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, অর্থনৈতিক আগ্রাসন এসবও যথেষ্ট ভুমিকা রেখেছে। ইওরোপীয়রা এদেশে এসে কেউ অস্থায়ী, কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে, তাতে হয়ত যুক্তিবাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়েছে কিন্তু ঐতিহ্য - আশ্রিত মূল্যভেদের পরবর্তন সে অর্থে ঘটে নি। বরং নতুন যুক্তিবাদের সাহায্যে ঐতিহ্যেরই নব মূল্যায়ন হয়েছে। যেমন ডিরোজিও (তিনি অবশ্য ইওরোপিয়ান), ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ব্যক্তিরা। বিবেকানন্দশিষ্যরা তো এদেশের অন্তর্ভুক্তই হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরাও প্রথম দিকে শুধু লুণ্ঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে, এদেশের মূলস্রোতেও অনেক মিশে গিয়েছে, সম্ভবত এরা এশীয় এই কারণেই। কিছু কিছু পারস্পরিকতার চেষ্টা হয়েছিল যেমন আকবরের দীন ইলাহী বা সুফি - মরমীয়াবাদ ইত্যাদি। কিন্তুশিক্ষাগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন তাদের তরফে ঘটেনি। বিপরীত দিক থেকে এদেশেও কিছুবিনিময় ঘটেছে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে. তবু জীবনের, জীবনযাপনের, মানব - আদর্শ বা লক্ষ্যবিষয়ে মূলগত কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। ইদানীং ভারতীয়রা হয়ত জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, ক্বচিৎ কদাচিৎ নিজেদের বৃহত্তর প্রয়োগ - সম্ভাবনায় কেউ কেউ ইওরোপ বা আরব দেশগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেইসব স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে থেকেও আন্তরিকভাবে তৃপ্ত একথা কিছুতেই বলা যাবে না। তাদের আচরণ, এদেশীয় সংস্কৃতিমনস্কতা, দেশের প্রতি গভীর টান ও মমত্ববোধ প্রমাণ করে, তাদের মনের গভীরে অন্তঃস্থিত মূল্যবোধের ব্যাপক কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। ঘটা সম্ভবও নয় কেননা ঐতিহ্যের শিকড় অস্বীকার করা অসম্ভব, তথাকথিত বিশ্বায়নও একটি অতিকথা যা আরো বেশী শোষণের জন্য অবলম্বিত একটি পন্থা মাত্র। প্রতিটি মানুষ তথা জাতি নিজস্ব সৃজনশীল মূল্যবোধে স্থিত থাকে, অন্যান্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলি তার কাছে কিছু কিছু জানালা মাত্র যা তার স্থিতিরশ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তা করে, তাকে চলমানতা দিয়ে গতিশীল করে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com